Rajshahi University journal of arts & law **ISSN 2309-0898 (Print)**
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 13-34 **ISSN 2408-8773 (Online)**
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0729

ঢাকা শহরের মুসলমান অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবন (১৮৫৮-১৯৪৭) [Daily life of The Muslim Residents in Dhaka City (1858-1947)]

সানজিদা আক্তার কেয়া*

Abstract

This study examines the quotidian existence of the Muslim community in Dhaka during the transformative British period (1858-1947). It examines the interplay of tradition, adaptation and socio-economic shifts. Dietary habits reflected a blend of local agricultural produce, riverine resources and influences from broader Islamic culinary traditions, often varying by social class. The difference between the rich and poor is clearly noticeable in the materials used and styles of housing. Attire generally consisted of traditional Islamic garments with variations in fabric and ornamentation, indicating social standard. Some western elements were also blended into attire. Muslim religious and social festivals were celebrated under the patronage of the Nawab's Palace Ahsan Manzil. The dominant language was Bengali, often with regional dialects and a notable presence of Urdu and Persian. From this article, we will able to learn about these important aspects of the daily life of the Muslim in Dhaka during this period.

Keywords: Dhaka city, Muslim residents, Food culture, Residence, Attire, Language, Festivals.

ভূমিকা

ঢাকা সুদূর অতীতকাল হতে নদীমাতৃক বাংলার প্রধান শহর। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বর্তমান বাংলাদেশ নামক অঞ্চলটি সাধারণভাবে পূর্ববাংলা বা পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা প্রথম জেলার মর্যাদা লাভ করলেও শহর হিসেবে ঢাকার ইতিহাস বাংলায় মুঘল শাসনামলের সূচনালগ্ন থেকে। তার পূর্বেও ঢাকায় মানব বসতির অস্তিত্ব ছিল বলে লিপি সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য প্রাচীন শহরের মত ঢাকারও রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হলেও ঢাকায় মুসলমানদের স্থায়ী বসতি এবং এর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার ইতিহাস মূলত মুঘলদের অধীনে। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা মুঘলদের বাংলা প্রদেশের রাজধানী হওয়ার পরে এখানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুবাদার ইসলাম খানের ঢাকা আগমনের সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, শিবিরের অন্যান্য কর্মচারী এবং মাঝিসহ প্রায় এক লক্ষ লোকের আকস্মিক আগমনে মুঘলদের এই সাধারণ ঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ এক শহরে পরিণত হয়। নবাগতদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য গড়ে ওঠে এক নতুন ঢাকা শহর।[১] মুঘল আমলে ঢাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্রসমূহ আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল, সিরিয় ও পারস্যের মতো দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য অভিবাসন আকর্ষণ করে যা মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত ছিল। মূলত ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এ সকল অভিবাসিরা প্রধান নগর ও শহরগুলিতে বসতি স্থাপন করে। যদিও সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ধর্মান্তরের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু ঢাকার মুসলমান জনসংখ্যা বিভিন্ন জাতিগত ও পেশাদার গোষ্ঠীর অভিবাসনের মাধ্যমে

* পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; E-mail: sunzedaakterkeya@gmail.com

উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছিল। এই অভিবাসিরা প্রশাসনিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণির মূল অংশ গঠন করে একটি স্বতন্ত্র নগরভিত্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে শহরের দ্রুত বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

অন্যদিকে, শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে আগমন ঘটে বিভিন্ন কারিগর, শিল্পী এবং উৎপাদনকারীদের। এদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়ার জন্য মুঘল শাসকেরা ঢাকায় তাদের বসবাসের জন্য লাখেরাজ (নিষ্কর) জমি বরাদ্দ করেছিল।[২] মুঘল সম্রাটরা ছিলেন সুন্নি এবং সুন্নি মতবাদকে তাঁরা উৎসাহিত করেছিলেন। পূর্ববর্তী তুর্কী এবং পাঠান সুলতানদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সতেরো শতকে ঢাকার শাসনকর্তা মুকররম খানের (১৬২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দ) সময় ঢাকায় প্রথম শিয়াদের আগমন ঘটে।[৩] মুঘল শাহজাদা শাহ্ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় আগমনকালে বহু সংখ্যক ইরানি পরিবারকে সাথে নিয়ে আসেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দু'জন প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তা মীর জুমলা ও শায়েস্তা খাঁনও ইরানি তথা শিয়া ছিলেন।[৪] বাংলার শাসনকর্তা পদে তাদের উত্তরাধিকারীগণ এবং দেওয়ান, বকশি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই ইরানি ছিলেন। ফলে তাদের সময় থেকেই শিয়া সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি ঢাকায় বেশ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে তা পূর্ববাংলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ঢাকার সমাজ কাঠামো ছিল ভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর এক প্রাণবন্ত সংমিশ্রণ। নায়েব নাজিমদের আমলে ঢাকায় শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায় ঘনিষ্ঠ মিত্রতা ও পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা বজায় রেখে বসবাস করতো।[৫] আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ঢাকা ক্রমশ ক্ষীণ শক্তিকেন্দ্র হয়ে আসছিল এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চূড়ান্তভাবে ঢাকা তার মুঘল ঐতিহ্য হারায়। শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ বাহ্যত নায়েব নাজিমদের হাতে থাকলেও নানা বিদেশি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার শুরু হয়। মুঘল অভিজাত ও শাসকশ্রেণির ক্ষমতা ক্রমশ কমে যাওয়ার পাশাপাশি ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে মসলিনের গুরুত্বও কমে যায়। এমতাবস্থায় ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজীউদ্দিন হায়দারের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর সরকার কর্তৃক ঢাকার নায়েব নাজিম পদটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। নুসরত জং (১৭৮৫-১৮২২) থেকে গাজীউদ্দিন হায়দার (১৮৩৪-১৮৪৩) পর্যন্ত পরবর্তী নায়েব নাজিমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে মুঘল আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে শুধু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিয়া মতাবলম্বী নায়েব নাজিমদের পতনের পর থেকে ঢাকায় শিয়াদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায় এবং সুন্নিদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে ঢাকার মুসলমান অধিবাসী বলতে স্থানীয় বাঙালি (কুট্টি), অল্প কিছু মুঘল আমল হতে বসবাসরত অভিজাত (খোশবাস/সুখবাসী) পরিবার ও ঢাকার প্রভাবশালী ব্রিটিশ সরকারের উপাধিপ্রাপ্ত নবাব (খাজা) পরিবার বিদ্যমান ছিল। এসময় ঢাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সুন্নি হলেও উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে শিয়া সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কাজেই ১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ সময়কাল ঢাকার মুসলমানদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আলোচ্য সময়কালে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ঢাকার মুসলমানেরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করে। ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববঙ্গ ছিল অবহেলিত জনপদ। ঢাকা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান শহর হলেও কলকাতার ন্যায় এখানে নবজাগরণ ঘটেনি। ঢাকায় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির জনবসতি থাকলেও মুঘল ও নবাবি আমলে বিকশিত ঢাকা একটি মুসলমান প্রধান শহর বলে বিবেচিত হতো। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় অগ্রসর হলেও সমাজ বাস্তবতায়

নানা কারণে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের ফলে তাদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ঢাকার মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-খাদ্যাভাস, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব ও ভাষার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এসময় ঢাকার মুসলমানেরা ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির পাশাপাশি পশ্চিমা প্রভাবিত বিভিন্ন রীতিনীতিকে আত্মীকরণ করে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করে। তবে এই পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত ধীর গতির এবং সমাজের সকল স্তরে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। প্রবন্ধটি রচনায় মানববিদ্যা গবেষণায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক গবেষণা ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি দলিলপত্র, সমকালীন জীবনীগ্রন্থ, রচিত সাহিত্যকর্ম এবং সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাসহ আধুনিক গবেষকদের লেখনীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে চিঠি বা ডায়েরির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আলোচ্য প্রবন্ধ হতে গবেষক ও পাঠক ব্রিটিশ আমলে (১৮৫৮-১৯৪৭) ঢাকার মুসলমান অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

প্রাত্যহিক জীবন

কোন সমাজকে জানতে বা তাদের সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথা সম্পর্কে জানতে হলে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করতে হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-কর্ম, আচার-বিশ্বাস তার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ঢাকা শহরের মুসলমান অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে জানতে হলে সে সময়ের প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক যেমন খাদ্য ও পানীয়, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব ও ভাষা সম্পর্কে জানা জরুরি।

খাদ্য ও পানীয়

ঢাকাবাসীর খাদ্যাভ্যাস ঢাকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বা প্রতিবিম্ব। ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি ঢাকাবাসীর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলেছে। ঢাকার অভ্যন্তরীণ ও এর আশেপাশের খাল ও নদীগুলোতে এক সময় সারা বছর পানি প্রবাহিত হতো। নদী তীরবর্তী স্থানগুলোতে প্রচুর ধান চাষ হতো, সারা বছর প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। ফলে প্রকৃতিগত কারণে স্বাভাবিকভাবে ঢাকাবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রধান স্থানে রয়েছে ভাত-মাছ। আলোচ্য সময়ে ঢাকার অভিজাত পরিবারগুলোতে রুটি প্রধান খাদ্য হলেও স্থানীয় সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, ডাল, সবজির তরকারি ও শাকভাজা।[৬] সাধারণত দুপুর ও রাতে বিভিন্ন তরকারি ও মাছের সহযোগে গরম ভাত খেত। গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থে বাঙালির খাদ্যাভাস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, সারা বাংলার মতো তারা মাছ, ভাত, সর্ষের তেল, দই, ফল ও মিষ্টি খেতে পছন্দ করত। প্রচুর লাল মরিচ ও লবণ তাদের প্রিয় ছিল। তারা গমের রুটি পছন্দ করত না।[৭] অধিকাংশ সময় তারা সকালের খাবারে পান্তা ভাত, লবণ ও মরিচ দিয়ে খেত। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে নানা রকম ভর্তা খুব জনপ্রিয় ছিল। ঢাকাবাসীদের আরেকটি উপাদেয় খাবার ছিল হরেক রকমের ভর্তাসহ খুদের ভাত।[৮] মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা সকালের খাবারে খুদের ভাতের পাশাপাশি বাসি ভাত, ডাল ও তরকারি সহযোগে খাটুয়া খিচুড়ি রান্না করত।[৯] ঢাকাতে পোলাও এর খাটুয়াও বেশ জনপ্রিয় ছিল সে সময়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে শহরে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে গমের খাবার অর্থাৎ রুটির প্রচলন ছিল।[১০] অভিজাত এই শ্রেণি রুটি বা পরোটা খেত মাংস, কাবাব, হালুয়া বা মিষ্টিজাতীয় খাবারের

সাথে। এসব খাবার রান্নার সময় প্রচুর মসলা, তেল ও ঘি ব্যবহার করত। তারা শুধু দুপুরে ভাত খেতেন। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গম উৎপাদনের কথা তেমন জানা যায় না। তবে ঢাকায় ইসলাম খানের আগমনের সময়কালে তাঁর সাথে পেশাজীবী রুটি প্রস্তুতকারীদের এখানে আসার তথ্য পাওয়া যায়।[১১] হাবিবুর রহমানের গ্রন্থে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর দিকের ঢাকা শহরের বাকরখানি ও অন্যান্য রুটি যেমন: শিরমাল, বাগদাদি প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১২] ভাত ও রুটির পাশাপাশি অনেক পরিবার প্রাতরাশে চিড়া, মুড়ি, ছাতু, খৈ, মুড়কি, গুড় প্রভৃতি খেত। গৃহিণীরা এ সকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করত। টেলর তাঁর বিবরণীতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার বাজারে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর্মেনীয়দের আমদানিকৃত চা-বিস্কুট ঢাকার অভিজাত পরিবারগুলোতে সকালের নাশতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে।[১৪] ঢাকাতে তখনো চা জনপ্রিয় না হলেও খাজা পরিবার পূর্ব থেকেই চা পানে অভ্যস্ত ছিল। নবাব খাজা আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) প্রচুর চা পান করতেন বলে জানা যায়।[১৫] পরবর্তীকালে ঢাকাবাসী মুসলমানদের মধ্যে চা-বিস্কুট খাওয়ার পাশাপাশি চায়ের সাথে মুড়ি, রুটি, পরোটা, পাউরুটি ও নিমশুকা রুটি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। ঢাকা শহরে চায়ের প্রচলন প্রসঙ্গে ঢাকার কাগজীটোলার দেবেন্দ্র দাস লেনের বাসিন্দা মোহাম্মদ আফজালের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়,

> চল্লিশের দশকে ঢাকায় লিপটন টি কোম্পানি বাড়িতে বাড়িতে সকালে ফ্রি চা সরবরাহ করত এবং প্যাকেট চা বিক্রি করত। কোম্পানির লোক ভ্যান গাড়িতে করে পিতলের বড় কেটলির মধ্যে গরম চা বিক্রি করত। বাড়িতে ডাকলে আমরা চায়ের কাপ ও কেটলি আনতাম। চা ভরে ঘরে নিয়ে যেতাম। ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকেও ঢাকাতে কোন ভাল আইসক্রিম পাওয়া যেত না।[১৬]

উনিশ শতকের শেষ দশকে ঢাকার ব্যবসাকেন্দ্র চকবাজার ও তার আশেপাশের এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর খাবারের দোকান গড়ে উঠলে তা ঢাকাবাসীর সকালের খাদ্যাভাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ছাগলের মাংসের কাবাব, পনির ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত।[১৭] এ সকল দোকানের পাশাপাশি মহল্লায় স্থানীয় দরিদ্র মুসলমান মহিলারা ঘরে মিষ্টি, হালুয়া, মোরব্বা বা পিঠা তৈরি করে বিক্রি করত। ফেরিওয়ালি মহিলারা মাথায় টুকরিতে করে সকাল বেলার নাশতা বিক্রি করত যাতে বাকরখানি, হালুয়া, কাবাব প্রভৃতি থাকত। অধিকাংশ পরিবার তখন দোকান কিংবা ফেরিওয়ালির নিকট থেকে পছন্দমতো নাশতা কিনে নিত।

জেমস টেলর তাঁর বিবরণে কুচিয়া, চান্দা, মাগুর, শিং, খলিসা, কৈ, বোয়াল, পাবদা, পাঙাস, টেংরা, বাতাসি, চিতল, ইলিশ ও তপসে মাছ ঢাকায় পাওয়া যাওয়ার কথা বলেছেন।[১৮] মাছ সম্পর্কে নানা তথ্য প্রদানের পাশাপাশি টেলরের বিবরণ থেকে এটাও জানা যায় যে শীতকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া পুটি মাছ সিদ্ধ করে মুসলমানেরা তেল উৎপাদন করত। এই তেল গরীব মুসলমানরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত। পনেরো সের মাছের তেল বাজারে এক টাকা পর্যন্ত বিক্রি হতো সে সময়।[১৯] ঢাকায় খেসারি, মসুর, মটর, মুগসহ নানা ধরনের ডাল উৎপাদিত হতো এবং এ অঞ্চলের মানুষ খেত বলে তিনি জানিয়েছেন।[২০] ভাতকে নরম ও মুখরোচক করার জন্য ডালের সাথে মাখিয়ে খাওয়ার রীতি ষোল শতকে বাংলায় শুরু হয় বলে জানা যায়। তাছাড়া কলমি শাক, হেলেঞ্চা, পুঁই শাক ও ঘেচু মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।[২১] দরিদ্র লোকেরা এগুলো সংগ্রহ করত তাদের খাবারের জন্য। পর্তুগিজদের আগমন এ অঞ্চলে আলুর প্রচলনে ভূমিকা রেখেছিল যা পরবর্তীকালে বাংলার অন্যতম প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়েছে। দরিদ্র মুসলমানেরা কখনো কখনো ডিম বা মুরগির মাংস খেতেন যা ছিল রীতিমতো বিলাসিতা।[২২] ঢাকায় মুঘল পূর্ব মুসলমানদের আগমনের সূত্র ধরে গরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগি ও কবুতরের মাংসের প্রচলন ছিল

স্বল্পমাত্রায়।[২৩] বহিরাগত অভিজাত মুসলমান বা খোশবাস সমাজে এ মাংসের প্রচলন রয়েছে আজো। এই অভিজাতদের অনুকরণে মোগলাই খাবার ঢাকার মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের শেষদিকে। ফলে কাবাব, কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানিসহ নানা খাবার জনপ্রিয় হতে শুরু করে। মাংসের চাহিদা পূরণে মুসলমানেরা গরু, ছাগল, মহিষ, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন করত। মুঘল আমল থেকে মুসলমানদের একটি শ্রেণি গরু পালন ও মাংস ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল, যারা সমাজে 'কসাই' নামে পরিচিত ছিল।[২৪] প্রাত্যহিক খাবারে গরুর গোশত ছাড়াও মুসলমানদের কোরবানির প্রধান পশু ছিল গরু। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান বাড়িতে মুরগি পালন করা হতো। হঠাৎ করে উপস্থিত হওয়া মেহমানকে আপ্যায়ন করার জন্য প্রধানত এটি করা হতো। সাধারণত পান-সুপারি দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করা হতো। তবে হুক্কা পানকারী ব্যক্তিরা কড়া ধরনের তামাক দিয়ে ধূমপান করত। ঢাকায় ৮ সদস্যবিশিষ্ট (৩ জন পূর্ণবয়স্ক ও ৫ জন শিশু) সাধারণ একটি পরিবারের দৈনিক খাদ্য ব্যয়ের হিসাব ছিল নিম্নরূপ।[২৫]

সারণি-১

বিবরণ	রুপি	আনা	পয়সা
চাল তিনবেলা (৫ সের)		৪	০
ডাল			৪.৫
তরকারি			৪.৫
নুন			৩
তেল			৪.৫
মশলা			৩
মাছ			৬
পান/তামাক			৪.৫

আলোচ্য সময়কালে মাটির চুলায় কাঠ কয়লার সাহায্যে ঢাকা শহরে রান্না সম্পাদন করা হতো। রান্নার কাজে সাধারণত মাটি কিংবা কাঁসার হাড়ি ব্যবহৃত হতো। দরিদ্র পরিবারে মাটির বাসন ও অভিজাত পরিবারগুলোতে চীনা মাটির বাসনপত্রে খাবার পরিবেশন করা হত। পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র ও গ্লাসের প্রচলন ছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলেও ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে কাঁসা বা তামার তৈরি হাড়ি, গ্লাস, জগ, কলসি শোভা বৃদ্ধি করত।

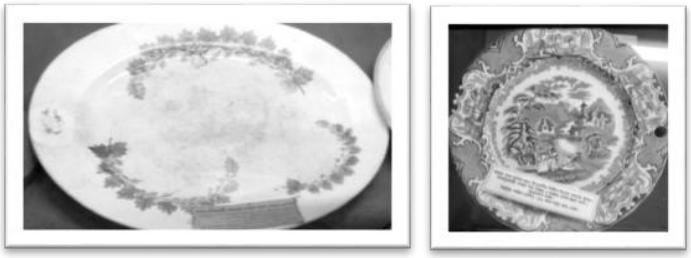

চিত্র: ১ ব্যবহার্য চীনামাটির বাসনপত্র (প্রথমটি ১৯১৭ খ্রি. বিবাহের উপহার ও দ্বিতীয়টি খাবার গরম রাখার বিশেষ ধরণের পাত্র)। 'ঢাকা কেন্দ্র', ঢাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, মওলা বখ্শ সরদার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা সৌজন্যে প্রাপ্ত।

খাবারের ক্ষেত্রে খাদ্য প্রস্তুত যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য পরিবেশনা। আলোচ্য সময়কালে ঢাকার লোকেরা মাটিতে পাটি বা চাদর পেতে কিংবা 'দস্তরখান' বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করত। আধুনিকতার প্রসারে এখন সে স্থান গ্রহণ করেছে চেয়ার-টেবিল। ঢাকার চারদিকে প্রচুর চারণভূমি ছিল বিধায় দুধের প্রাচুর্য ছিল। তাই খাদ্য গ্রহণ রীতিতে তিতা, নোনতা বা ঝাল খাবার দিয়ে শুরু করা হলেও শেষ করা হতো মিষ্টি খাবারের মধ্যে দিয়ে। এ মিষ্টির মধ্যে ছিল দুধের তৈরি পায়েস ও দুধের নানা রকম পিঠা। আলোচ্য সময়কালে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে খাবার পরিবেশনকে গুরুত্ব দেয়া হতো আর বর্তমানে নিজে নিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমকালে ঢাকার উচ্চবিত্ত সমাজে খাবার পরিবেশনের বিশেষ পদ্ধতি 'তোরাবন্দি'[২৬] ছিল বিখ্যাত। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এর ব্যবস্থা করা হতো। অনেক সময় ঈদের দিন কিংবা বিশেষ মেহমান উপলক্ষে অভিজাত পরিবারে 'তোরাবন্দি' খাবারের আয়োজন করা হতো। বর্তমানে এসব খাবারের কিছু কালের অতলে হারিয়ে গিয়েছে। কিছু হুবহু আবার কিছু সামান্য পরিবর্তিত হয়ে টিকে রয়েছে ঢাকার ব্যক্তি বিশেষের অন্দরমহলের সৌখিন রসনাবৃত্তিতে। আবুয যোহা নূর আহমদের বর্ণনায়,

> রইসদের বাড়িতে এইসব খাবার প্রস্তুত হইত। সারি সারি চীনা পেয়ালা ও বাসনকোসনে সাজায়ে মেহমানদের সামনে এইসব খাবার রাখা হইত। এই খাবারের সারিতে থাকিত চার প্রকারের রুটি চার রকমের পোলাও, চার রকমের নান জাতীয় রুটি, চার প্রকারের কাবাব ও চার প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ছাড়াও পনির, বোরানি, চাটনি ও আচার অর্থাৎ প্রত্যেক পদের খাবার চার পদের থাকিত। মোট চব্বিশ পদের নীচে থাকিত না।[২৭]

বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে যেমন বিয়ের বর যাত্রীদের আপ্যায়নে সম্ভ্রান্ত বাড়িতে মোরগ পোলাও দিয়ে আপ্যায়নের রেওয়াজ ছিল। তবে সাধারণত সামর্থ্য অনুযায়ী সাদা পোলাও, ডাল, গোশত, পান ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা থাকতো। বিয়ে উপলক্ষ ছিল ঢাকার বাবুর্চিদের রান্নার কারিশমা দেখানোর প্রধান ক্ষেত্র। ধনী ও অভিজাত বিয়ে বাড়িতে ডাক পড়ত লক্ষ্মীবাজারের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ময়রাদের। বাড়িতে এসে বিয়ে উপলক্ষে তৈরি করতেন চাহিদা মোতাবেক বিশাল বিশাল সাইজের বিশেষ মিষ্টান্ন। এছাড়াও তারা 'নওশা' বা দুলহার জন্য বিশেষভাবে সাজিয়ে খাবার উপস্থাপন করেন। বরের জন্য প্রস্তুতকৃত এই বিশেষ খাবারকে 'সাহেবানা' বলা হয়।[২৮] আখতার ইমাম (১৯১৭-২০০৯) নিজের বিয়ের স্মৃতির কথা উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> আমাদের কালে ঢাকার মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়েতে সাধারণত খানার আইটেম ছিলো যথার্থই রিচ। যেমন সাদা পোলাও, পেশোয়ারী চালের মোরগ পোলাও, খাসীর কালিয়া, গরুর গোশতের টিকিয়া কাবাব এবং মিষ্টির মেনু ছিল পেশোয়ারী চালের জর্দা জাফরান, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, গোলাপজলে ভরপুর এবং পোলাওর চালের গুঁড়ো দিয়ে শুধু দুধে রান্না বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, গোলাপজল দিয়ে মনমাতানো ফিরনী।[২৯]

প্রাত্যহিক জীবন যাপনের পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে ঈদ উৎসব উদযাপনের বড় আকর্ষণ ছিল রকমারি খাবার-দাবার। ঢাকার ঈদের দিনের খাবার সম্পর্কে নাট্যকার সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়,

> নামাজ পড়ে ফিরে এসে সবাই প্রথমে দুধে ভিজিয়ে রাখা সরু করে কাটা খোরমা আর সেমাইয়ের জর্দা খেতাম . . . সবাই একসঙ্গে এক দস্তরখানে বসে সাদা পোলাও, কোর্মা, কালিয়া খেতেন। ঈদের দিন এমন কোনো বাড়ি ছিল না যে বাড়িতে বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও হতো না। প্রচুর পরিমাণে রান্না করা

> হতো যেন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে পোলাও খাওয়ানো সম্ভব হতো। রাত পর্যন্ত চলতো মেহমানদারি পালা। তিন দিন পর্যন্ত ঈদের উৎসব চলতো। দাওয়াত করে বিশেষ আত্মীয়দের বিশেষ বিশেষ খাবারের আইটেম দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো।[৩০]

খাওয়া-দাওয়া আর রান্নার জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ঢাকায় নিরাপদ খাবার পানির কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।[৩১] সে সময়ে ঢাকা শহরে ঘরে ঘরে পানি সরবরাহ করার পেশায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা 'ভিস্তি' নামে পরিচিত ছিলেন। এরা ছাগলের চামড়ার মশকে করে ঘরে ঘরে খাবার পানি দিয়ে যেতো। ভিস্তিদের বর্ণনা শামসুর রাহমানের গ্রন্থ থেকে জানা যায়।[৩২] নগরীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রশাসন ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এ বছরে। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে পুরো শহরে ফিল্টার করা পানি গাড়ি করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে নগর প্রশাসন সমর্থ হয়েছিলো।[৩৩] ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করেছিলো,"ঢাকা বহুতর গলি এবং তাহাতে অনেক লোকের বাস। তাহাদের রোগ, শোকে ও দুঃখে ঢাকার পক্ষদর্শী মিউনিসিপল কমিটির একবিন্দু নেত্রজল পতিত হয় না। আমরা জানি জলের কলের সমস্ত ভার মিউনিসিপ্যালিটির হাতে রয়েছে . . . গলিগুলির প্রতি দৃষ্টি নেই।"[৩৪] তাছাড়া ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি মাসিক চার রুপি করের বিনিময়ে বাসগৃহসমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে সমর্থ হয়।[৩৫] তবে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দরিদ্রদের বঞ্চিত করা হতো তা বিভিন্ন এলাকার পানি কলের (হাইড্রান্ট) সংখ্যা বিচারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৯৪-৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:[৩৬]

সারণি-২

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি	পানি সরবরাহ	নির্গমন লাইন	রাস্তা সংস্কার ও ল্যাট্রিন	হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি	কসাইখানা ও বাজার
বরাদ্দ (রুপি)	১৪৭৬৯	৩১৯৩	৫০৬১৭	১৯৩৭১	২৬৬০

বাসগৃহ ও গৃহস্থালী

বাংলায় বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত সহজলভ্য উপকরণের উপর ভিত্তি করে বাড়িঘর নির্মিত হয়। তবে মুঘল আমলের ইটের তৈরি ঐতিহাসিক অনেক মসজিদ, ইমারত ও স্থাপত্য প্রমাণ করে উচ্চবিত্তের বাড়ি বা প্রাসাদ সম্ভবত ইট দ্বারাও নির্মাণ করা হতো। তাই রমনা এলাকায় (বাগ-ই-বাদশাহী) মুঘল আমলের প্রতিষ্ঠিত মহল্লা সুজাতপুর ও মহল্লা চিশতীয়ায় ইটের তৈরি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন বলে মোহাম্মদ তৈফুরের (১৮৮৫-১৯৭২) গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা নগরের আয়তন ছিল পাঁচ বর্গমাইল। যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত তা কেবল নদীর তীর বরাবর গড়ে উঠেছিল যা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১.২৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। শহরের অভ্যন্তরভাগ ধোলাইখালের একটি শাখা দ্বারা বিভক্ত ছিল।[৩৮] ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ হেবার ঢাকায় এসে এর অবনতি প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮০১-১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শহরের কাছাকাছি অনেক অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় শহরের কাছাকাছি অনেক এলাকা যেমন নারিন্দা, ফরিদাবাদ, উয়ারি ও আলমগঞ্জের বেশিরভাগ পরিত্যক্ত হয় যা এক সময় ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। তাছাড়া উত্তরে ফুলবাড়িয়া, দেওয়ান বাজার, মনোহর খান বাজার এবং উত্তর-পশ্চিমে ঢাকেশ্বরী, আজিমপুর ও এনায়েতগঞ্জ এলাকা যেখানে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে লোক বসতি ছিল তা ১৮৪০ দশকে সম্পূর্ণ জনবিরল হয়ে পড়ে।[৩৯]

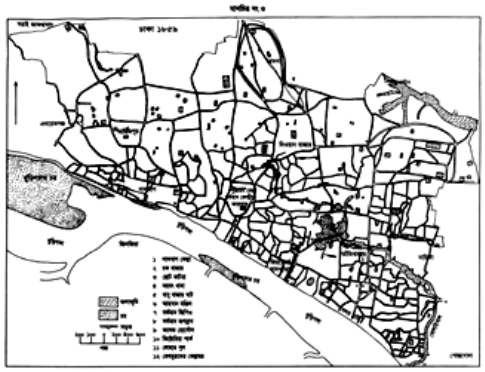

চিত্র: ২ ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরের মানচিত্র (চার্লস ড'য়লি, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, পৃ. ৫৩)

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের নতুন 'টপোগ্রাফিকাল' মানচিত্র হতে দেখা যায় শহরের প্রধান এলাকাটির দৈর্ঘ্য মাত্র সোয়া তিন মাইল ও প্রস্থ সোয়া মাইলে পরিণত হয়েছে ।[৪০] তখন শহরের আকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে ফরাশগঞ্জ, দক্ষিণ মৈশুণ্ডী, ঠাঁটারীবাজার, কোতোয়ালি, কুমারটুলি, জিন্দাবাজার, মালিটোলা, বেচারাম দেউড়ি, পুরানো জেলখানা, হোসেনি দালান, নয়াবাজার, আর্মানীটোলা এবং নবাবগঞ্জ পর্যন্ত সীমানা বিস্তৃত ছিল।[৪১] উনিশ শতকে ঢাকা শহরের মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র আমরা নিম্নলিখিত সারণি থেকে পাইঃ[৪২]

সারণি-৩

সময়কাল	হিন্দু জনসংখ্যা	শতকরা (%)	মুসলমান জনসংখ্যা	শতকরা (%)
১৮৩০	৩১৪২৯	৪৭.১৪	৩৫২৩৮	৫২.৮৬
১৮৩৮	২৮১৫৪	৪৬.৪৬	৩২৪৩৬	৫৩.৫৩
১৮৭২	৩৪৪৩৩	৫০.১১	৩৪২৭৫	৪৯.৮৯
১৮৮১	৩৯৬৫৮	৫০.৪৭	৩৮৯১৩	৪৯.৫৩
১৮৯১	৪১৫৬৬	৫০.৮৫	৪০১৮৩	৪৯.১৫
১৯০১	৫১২৪৭	৫৫.১২	৪১৭২৮	৪৪.৮৮

কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলে শাসকশ্রেণি ও সাধারণ জনগণের জন্য পরিকল্পিতভাবে আলাদা এলাকায় আবাস গড়ে তোলা হয়। এসময় ঔপনিবেশিক শাসকেরা এমনভাবে নগর পরিকল্পনা করে যাতে অভিজাতদের সাথে স্থানীয়দের একটি পার্থক্য সূচিত হয়।[৪৩] ঢাকা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল নিম্নশ্রেণি ও স্বল্প আয়ের মানুষ। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় 'ঢাকা শহরে ময়লা নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই এবং যুগ যুগ ধরে এই মলমূত্র, আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছিল শহরের লোকদের বাড়ির আঙ্গিনায় ও রাস্তায়। শহরের কুয়োর পানি দূষিত এবং দুর্গন্ধময় ড্রেন উপচে পড়ছিল ময়লা। এছাড়া শহর বিভক্ত ছিল অসংখ্য সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে।'[৪৪] এই স্যাঁতসেঁতে ঘিঞ্জি গলি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার কারণে বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকাবাসী নানা মহামারীর সম্মুখীন হতো। তাছাড়া অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার জন্য তাদের মৃত্যুহারও বেশি ছিল। শহরের অধিকাংশ অধিবাসীর ঘরবাড়ি তৈরি করা হতো বাঁশ, মাটি, কাঠ, খড়, নলখাগড়া ও গোবর দিয়ে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের জন গণনার প্রতিবেদন অনুযায়ী পাওয়া যায় যে ঢাকা জেলার চাষীরা যে ধরনের ঘরবাড়িতে বসবাস করে বেশিরভাগ খড়ের ছাউনি দেয়া মাটির কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরগুলির ছাদ বাঁশের খাঁচার উপর উলুঘাসের ছাউনি দেয়া বা মধুপুরের জঙ্গল থেকে আনা বিরাট কাওলা

পাতার ছাউনি।[৪৫] তবে পরবর্তীকালে ঢাকায় টিনের ঘরও তৈরি হতে থাকে। দোচালাবিশিষ্ট এই ঘরগুলোকে সাধারণত বাংলা ঘর বলা হতো। দরিদ্রশ্রেণির লোকেরা এ ধরনের ঘরে বসবাস করত। মধ্যবিত্ত সৌখিন পরিবারের লোকেরা চৌচালা বা আটচালা ঘর তৈরি করত। বিত্তবান লোকেরা উন্নতমানের বাঁশ বা কাঠ ব্যবহার করলেও দরিদ্রদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না। উনিশ শতকের শেষদিকে ঢাকার সম্প্রসারণ ঘটে এবং কিছু নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি কর্মকর্তাদের ওয়ারি এলাকায় তিন বছরের মধ্যে বাড়ি তৈরি করার শর্তে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। মূলত এটি ছিল ব্রিটিশ আমলে নগরীর প্রথম পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা।[৪৬] ব্রিটিশ প্রভাবে শহরের এই নতুন এলাকাসমূহে প্রশস্ত রাস্তা ও পরিকল্পিত আবাস গড়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পরে শহরের রমনা এলাকায় পশ্চিমা ধাঁচে আবাসিক এলাকা ও ঘরবাড়ি গড়ে ওঠে। এসময় অভিজাত এ এলাকাসমূহে ইটের একতলা, দোতলা এবং তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি গড়ে ওঠে। তবে অধিকাংশ দেশীয় শহরের মতো এসময়ও ঢাকার বাকি এলাকা কুঁড়েঘর, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথ ইত্যাদি নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছিল। তখন পৌরসভার সীমানা উত্তরে সেগুনবাগিচা, মগবাজার, শাহবাগ এবং ধানমন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪৭] ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে শহরের পশ্চিম দিকে বাড়িঘর ও রাস্তার বিস্তৃতি ছিল হাজারিবাগ, মনেশ্বর ও পিলখানা পর্যন্ত। উত্তর দিকে শহরের সীমানা নির্ধারণ করা বেশ কষ্টকর। কেননা প্রতিনিয়ত এদিকে শহর সম্প্রসারিত হয়ে চলেছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে মুনতাসীর মামুন এই ভবনের বর্ণনা করেছেন, "এসময় আহসান মঞ্জিলের উপর তলার পূর্বদিকে ছিল বৈঠকখানা, লাইব্রেরি ও অতিথিদের জন্য তিনটি ঘর। পশ্চিম দিকে ছিল বল নাচের ঘর, নবাবদের শোবার ঘর। নীচের তলায় ছিল সমসংখ্যক ঘর তবে পূর্বদিকে আরো ছিল খাবার ঘর, পশ্চিমে বিখ্যাত দরবার হল।"[৪৮] ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শিক্ষানগর। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ঢাকার বাইরে থেকে বহু ছাত্র ঢাকাতে পড়তে এসে জায়গির থেকেছে। ঢাকার অন্তঃপুর বিষয়ে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) আত্মজীবনী থেকে কিছুটা জানা যায়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জগন্নাথ কলেজে পড়াকালীন তিনি ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টার অধিবাসী হাকিম আরশাদ আলী সাহেবের বাড়িতে জায়গির থাকতেন। প্রায় দেড় বছর হাকিম সাহেবের বাড়িতে জায়গির থেকে আই.এ পাশ করেন তিনি। আবুল মনসুর আহমদের বর্ণনায়, "ছেলেমেয়েরা আমার অতিশয় যত্ন নিতেন। বিবি সাহেব যদিও পর্দা করিতেন এবং কখনও আমার সামনে আসিতেন না, তথাপি আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সর্বদাই খবর নিতেন। ছেলেমেয়েরা না থাকিলে পর্দার আড়াল হইতে কথা বলিয়া আমার খোঁজ খবর করিতেন।"[৪৯] আবু জাফর শামসুদ্দীনও (১৯১১-১৯৮৮) তাঁর স্মৃতিকথায় তেমনিভাবে ছাত্রাবস্থায় জায়গির থাকাকালে ঢাকার সাধারণ নিম্নবিত্ত মুসলমান পরিবার ও পরিবেশের বর্ণনা করেছেন,

> সময়টা বোধকরি ১৯২৭ সালের শেষ অথবা ১৯২৮ সালের প্রথম দিক। এবার জায়গির হলো রায় সাহেবের বাজারের বিপরীত দিকের গলি নাসিরুদ্দীন সর্দার লেনে ইলিয়াস সর্দার সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদের নিকটের অতি সরু গলিতে। বাড়ির মালিকের নাম রমু ওস্তাগর। ... এ পরিবারটিও বস্তির মধ্যে মাটির দেয়াল ঘেরা টিনের ছাপড়ায় বসবাস করত। হাত তিনেক প্রশস্ত একটি উপগলিতে বাড়ী। বাইরে একটি ছোট কামরা। কায়ক্লেশে একটি চৌকি, একটি ছোট টেবিল এবং দুটি ফোল্ডিং চেয়ার পড়ে। চৌকির উপরে দাঁড়ালে মাথায় টিনের চাল ঠেকে ঠেকে অবস্থা। ভিতরের দিকে জানালা ছিল না, একটি দরজা ছিল, সেটি দিয়ে আজহার হোসেন আমার ভাত তরকারি দিয়ে যেতো। এ বাড়িতেও বাইরের লোকের জন্য পায়খানা ছিল না।[৫০]

বাংলাদেশের দুজন সাহিত্যিকের আত্মজীবনী থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে তখন মুসলমান মহিলারা পর্দাপ্রথা পালন করত এবং ঢাকার অন্দরমহলের বাসিন্দাদের সাথে বাইরের লোকজনের কোন দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। বিশ শতকের গোড়ায়ও ঢাকাতে যৌথ পরিবার বিদ্যমান ছিল। একান্নবর্তী, যৌথ, সম্প্রসারিত ও অনু পরিবার অর্থাৎ সকল পরিবারের কর্তা ছিল পুরুষ আর মহিলাকে বলা হত গৃহিণী। মহিলার কাজ ছিল সন্তান প্রতিপালন, গৃহকর্ম সম্পাদন এবং পরিবারের সদস্যদের সেবাদান। এসকল কাজ অর্থকরী হিসেবে বিবেচিত হতো না বলে মহিলাকে সর্বতোভাবে পুরুষের অধীন ও নির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হতো। অর্থাৎ পরিবারের বাইরে পুরুষের বিচরণ আর মহিলা অন্তঃপুরবাসিনী, গৃহের চারদেয়ালে সীমাবদ্ধ ছিল তার ক্ষেত্র। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মায়ের কোন বিশ্রাম ছিল না। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের সব কাজ তাকে করতে হত। তবে উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারে কাজের লোক বা অনেক দাসদাসী থাকত। ফলে ধনী ঘরের গৃহিণীরা অনেক অবসর পেতেন, অবসর যাপনের বহু উপকরণও তাদের ছিল।[৫১] বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণির অবস্থাপন্ন অনেক মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী থাকত। সমাজে তখনো বাঁদি বিয়ের প্রচলন ছিল। বাঁদি বিয়ের প্রথার উল্লেখ করতে গিয়ে আখতার ইমাম লিখেছেন তাঁর দাদার 'বান্দী বউ' ছিল। এসব বিয়ে সে যুগের মিঞা পরিবারের নিয়ম মাফিকই হতো।[৫২] পুরোনো ঢাকার অধিবাসী এবং বাইশ পঞ্চায়েতের সরদার মির্জা আবদুল কাদের সরদারের উত্তরসূরি বিশিষ্ট নাট্যকার সাঈদ আহমেদ (১৯৩১-২০১০) পরিবারে মহিলার ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমাদের পরিবারটি ছিল একান্নবর্তী পরিবার। একান্নবর্তী পরিবারে ঝগড়াঝাটি হরহামেশা চলত। আমার মা সব সামাল দিতেন।"[৫৩] হাবিবুর রহমানের গ্রন্থে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর দিকের ঢাকা শহরের অন্দরমহলের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন সাধারণত মহিলারা গৃহকর্মে নিপুণা হতেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় তাদের কাটতো রন্ধনশালা ও বাড়ির উঠানে কুয়ার পাড়ে। তিনি রমযান মাসে সেহেরি ও ইফতারিতে মহিলারা কি কি খাদ্য প্রস্তুত করতেন তার যে সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তবে এই রসনা বিলাসের আড়ালে মহিলাদের উদয়াস্ত শ্রমের স্বীকৃতি কোন যুগেই দৃশ্যমান হয়নি।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার

পোশাক নির্ভর করে দেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির উপর। বাংলার আবহাওয়া আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় সবমসময় হালকা পোশাক এদেশের উপযোগী। আর্থিক সঙ্গতি ও আভিজাত্য অনুসারে মহিলারা বিভিন্ন প্রকারের ও মূল্যের শাড়ি পরিধান করত। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের একটা ব্যাপক অংশের সাধারণ পোশাক ছিল ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদর। দেশ বিভাগের পর অল্প সময়ের মধ্যেই ধুতির স্থান লুঙ্গি দখল করে নেয়।[৫৪] শহরের মহিলা-পুরুষের পোশাকে বিশেষ কোনো বাঙালি বৈশিষ্ট্য দেখা না গেলেও বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় বাঙালির এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। গ্রামের পুরুষরা গরমের সময় লুঙ্গি অথবা ধুতি পরতেন, সেই সাথে একটি গেঞ্জি পরতেন অথবা খালি গায়ে থাকতেন। বেড়াতে গেলে পাঞ্জাবি, ফতুয়া অথবা জামা পরতেন। শীতের সময় অতিরিক্ত পোশাক হিসেবে একটি চাদর ব্যবহার করতেন। আর মহিলারা শাড়ি পরতেন, সঙ্গে একটা পেটিকোট এবং ব্লাউজ।[৫৫] সাধারণ গৃহস্থের পুরুষরা অল্পদামের মোটা কাপড়ের লুঙ্গি ও গামছা এবং মেয়েরা শুধু তাঁতের কাপড় ব্যবহার করত। অভিজাত ঘরের মেয়েরা ঢাকাই শাড়ি, শান্তিপুরি শাড়ি, জামদানি শাড়ি ব্যবহার করত। সিল্কের ব্যবহার তেমন ছিল না; কেবল বিয়ের সময় বেনারসি শাড়ি ব্যবহার করা হতো। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে ঢাকাবাসীর ঈদের পোশাকে ভিন্নতার পাশাপাশি নতুন সংযোজনও ঘটে। কামরুদ্দীন আহমেদ এ সম্পর্কে লিখেছেন, অভিজাত ঘরের ছেলেরা জুমার নামাজ, ঈদের সময়, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবের দিন আচকান, পাজামা ও জড়োয়া টুপি ব্যবহার করত।[৫৬] এই পাজামা-পাঞ্জাবী বা আচকানের ব্যবহার শুরু হয় খুব সম্ভবত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হতে। যেসব পরিবার শহরে চাকুরি করত মূলত তারাই ঈদে শুরু করেন এ সকল পোশাকের ব্যবহার। পাশাপাশি আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়

শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী মুসলমানরা ক্রমশ পশ্চিমা পোশাকের প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করে। পরবর্তী ধাপে মুসলমানদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহার কমতে শুরু করে এবং কোট, প্যান্ট, শার্ট এবং ছোট মেয়েরা বিশেষত বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নানা ডিজাইনের জামা-কাপড় পরতে শুরু করে। তখন পর্যন্ত মুসলমান মহিলারা কুঁচি দিয়ে কাপড় পরতে শুরু করেনি। আধুনিক ও অভিজাত মহিলারা লম্বা হাতার নানা ডিজাইনের ব্লাউজের সাথে ভাঁজ করে শাড়ি পরিধান করতেন। নবাববাড়ির মহিলাদের ও শিক্ষাবিদ ফজিলাতুন্নেসার দুষ্প্রাপ্য চিত্র থেকে আমরা তা জানতে পারি। পোশাকের এই পরিবর্তনের প্রভাব নবাববাড়ির সদস্যদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে ঢাকার নবাববাড়ির মিঞাদের পোশাক ছিল সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা এবং তার উপরে ব্রিটিশ কোট।[৫৭] ঢাকার জিন্দাবাহার চৌধুরী পরিবারের শিক্ষিত কন্যা আমেতুল খালেক বেগমের (জন্ম ১৯৩৮) লেখা থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলাদের প্রাত্যহিক পরিধেয় বস্ত্রের কথাও আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন "ছোট মেয়েরা নিজ পছন্দ মতো ফ্রক/হাফ প্যান্ট এবং ছেলেরা সার্ট/প্যান্ট বা পায়জামা পরে স্কুলে যেত। বড় মেয়েরা শাড়ি পরে যেত। ... মুসলমান মেয়েরা অনেকে বোরকা পরতেন।"[৫৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পুরানো ঢাকার অধিবাসী আখতার ইমামের (১৯১৭-২০০৯) বর্ণনায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রের কথা স্থান পেয়েছে,

> সাধারণত আমরা ছেলেবেলায় হাঁটুর একটুক উপরে ফ্রিলওয়ালা পায়জামা ও হাঁটুর একটুক নীচ পর্যন্ত ফ্রক পরতাম, অবশ্য নানা ডিজাইনের। তবে কোনটিই হাতাকাটা ছিলো না। বড়োরা পরতেন মোটা-মিহি মিলের শাড়ী। ঢাকাই তাঁত, জামদানী, শান্তিপুরী, যশোরের শাড়ীও অনেকে পরতেন। ... চটি জুতোর চল ছিলো বাড়ির জন্য। পামসু, হিল তোলা জুতো ও জরির কাজ করা নাগরা পরতাম বেড়াতে যেতে। রোজার ঈদে কি ধরনের জুতো কিনবো তার প্লান ঈদের তিন-চার মাস আগে থেকেই করে নিতাম। সেই সঙ্গে রং বেরং এর রেশমী ও বেলোয়াড়ী চুড়ির ফরমাসটিও আঁটসাঁটভাবে গাঁথা থাকতো। মেহেদী পাতায় হাত রাঙানো ছিল যেন আমাদের কাছে ঈদের খুশির একটি বিশেষ অঙ্গ।[৫৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তেমন কোন প্রসাধনী সামগ্রী পাওয়া যেত না। মেয়েরা কাজল ও সুরমা প্রভৃতি দিয়ে চোখ সাজাতো। মেহেদি পাতার রঙে হাত সাজাতো, নানা রঙের ফিতা দিয়ে তাদের চুল বাঁধত। তাছাড়া চুড়িওয়ালীর নিকট থেকে কম বেশি সকলেই নানা রঙের চুড়ি কিনতো। খাজা মওদুদের ডায়েরি থেকে জানা যায় ২৭ জুলাই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য ৪ টাকা ১৩ আনা দিয়ে একটি মলমলের শাড়ি কেনেন।[৬০] ঢাকার অভিজাতশ্রেণির মহিলারা স্বর্ণ, রূপা ও মুক্তা দ্বারা তৈরি অলঙ্কার এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকেরা টিন, পিতল, সীসা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি গহনা ব্যবহার করত।[৬১] স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়ায় অধিকাংশ মহিলা রূপার গহনা বেশি ব্যবহার করত। তবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হতে মহিলাদের মধ্যে অতিরিক্ত অলঙ্কার পরার প্রবণতা ক্রমশ কমতে শুরু করে। ঢাকার মহিলারা কী ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করত এবং সেকালে সেগুলোর মূল্য কত ছিলো তা জানা যায় ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সরকারি প্রতিবেদনে।[৬২]

সারণি-৪ (স্বর্ণের তৈরি অলঙ্কার)

উপাদান	রুপি	আনা	পয়সা	থেকে	রুপি	আনা	পয়সা	মন্তব্য
নথ	৪	০	০		১৫	০	০	
বোলাক	৫	০	০		৬	০	০	
গলার জন্য সোনলো	২	৮	০		৩	০	০	

সারণি-৫ (রূপার তৈরি অলঙ্কার)

উপাদান	রুপি	আনা	পয়সা	থেকে	রুপি	আনা	পয়সা	মন্তব্য

হাসুঁলি	৪	০	০		২৫	০	০	
খাড়ু	৪	০	০		২৫	০	০	
বাউটি	১০	০	০		২০	০	০	
বেসাক	২	০	০		৫	০	০	মুসলমানরা ব্যবহার করে না।
বালা	৪	০	০		৫	০	০	
নথ	৩	০	০		৬	০	০	
ফুল	৪	০	০		৪	০	০	
কাটাবাজু	৬	০	০		৮	০	০	
চুব মাদুলি	১	৮	০		২	০	০	
চূড়	১০	০	০		২০	০	০	হিন্দুরা ব্যবহার করে না।
কঙ্কণ	৪	০	০		৫	০	০	

সমকালীন ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্যক্তিরা কি ধরনের পোশাক পরতেন তার একটি নমুনা পাওয়া যায় হেকিম হাবিবুর রহমানের (১৮৮১-১৯৪৭) পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে। সে সময় হিন্দু মুসলমান সকলে শ্রেণিভেদ অনুযায়ী টুপি পরিধান করতেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে টুপি ছিল সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক। হেকিম হাবিবুর রহমানের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' মুখবন্ধ অংশে ঢাকার রাজনীতিবিদ ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উল্লেখ করেছেন,

> হেকিম হাবীবুর রহমান নিমন্ত্রণ ও বৈঠকসমূহে প্রাচীন ধরনের আঙ্গরাকখা বা বোতামবিহীন প্রাচীন আচকান কিংবা ঢাকার অনুপম ও মূল্যবান জামদানি কাপড়ের আচকান পরতেন। মাথায় কখনো পাঠানি কায়দায় খুব ঢিলা পাগড়ি বাঁধতেন বা কামদানি অর্থাৎ নকশা করা কাপড়ের কিস্তি টুপি বাঁকা করে পরতেন। শীতকালে কাঁধের উপর বড় মাপের কাশ্মীরি রুমাল ব্যবহার করতেন। হাতে মির্জাপুরি বাঁশের ছোট লাঠি রাখতেন যার উপরে রুপার আবরণ লাগানো ছিল।[৬৩]

সমকালে ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্যক্তিরা কী ধরনের পোশাক পরতেন তার আরও একটি উদাহরণ পাওয়া যায় শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) বর্ণনায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকার সম্ভ্রান্ত বাংলাভাষী মুসলমান বাইস (বাইশ) পঞ্চায়েত প্রধান আলীজান ব্যাপারীর পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে লিখেছেন,

> আলীজান ব্যাপারী পাম্পসু পায়ে গলি পেরুচ্ছেন, চলেছেন নিজের বাড়ির দিকে। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতেন আলীজান ব্যাপারী। ... একসময় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত তার জুতোর শব্দ, গলি পেরুনো শেষ। আলীজান ব্যাপারীর সাবান আর তামাকের দোকান ছিল মস্তো। দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরতেন তিনি অনেক রাতে। তাঁকে কোনদিন পাজামা পরতে দেখিনি কিংবা চোগা-চাপকান। কান-ঢাকা পাগড়ীও পরতেন না তিনি। পরতেন লুঙ্গি, কখনো একরঙা, সাদাসিধে, কখনো ডোরাকাটা আর পরতেন পাঞ্জাবী। সবসময় মাথায় গোল একটা টুপি থাকতো কাপড়ের। পায়ে পাম্পসু-সারা মহল্লার কান খাড়া হতো তাঁর পাম্পসুর শব্দে।[৬৪]

সাহিত্যিক আবুল ফজলের ঢাকা মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে ২১/০৪/১৯৩০ তারিখে ডায়েরিতে লেখা থেকে জানা যায় অভিজাত ও বাঙালি মুসলমানদের পোশাকের সংমিশ্রণও দেখা যেত ঢাকার ছাত্র সমাজে। তিনি বিষয়টিকে সৌন্দর্য আর পরিমিতিবোধের অভাব বলে অভিহিত করেছেন।[৬৫] কাজেই বলা যায় যেসব মুসলমান নিজেদের আশরাফ বা সুখবাসী (স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত অভিজাতশ্রেণি) মুসলমান

বলে মনে করতেন তাদের নিজস্ব পোশাক ছিল মুঘল ঐতিহ্যবাহী পায়জামা, চৌগান, চাপকান ইত্যাদি এবং মাথায় নানা আকৃতির ও নকশা করা টুপি। অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত বাঙালি ও শ্রমজীবী কুট্টি মুসলমানদের পোশাকে লুঙ্গি, ফতুয়া বা পাঞ্জাবি এবং সাধারণ গোল টুপির প্রাধান্য ছিল। ধুতি হিন্দুদের পোশাক হলেও অনেক মুসলমান বিশেষ করে ছাত্ররা তা পরতেন ফতুয়া ও শার্টের সাথে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত। তবে এসময় পোশাক তৈরির ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সাথে পশ্চিমা পোশাকের কিছু উপাদান মিশিয়ে নতুন ফ্যাশন তৈরি করেন। যেমন: পাঞ্জাবির সাথে কোট পরা, শার্টের সাথে অধিক ঘেরযুক্ত পায়জামা কিংবা শাড়ির সাথে বিভিন্ন ডিজাইনের লেস ও হাতাযুক্ত ব্লাউজ ব্যবহার প্রভৃতি।

উৎসব

আবহমানকাল ধরে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের একঘেঁয়েমি বা বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তি পেতে উৎসব পালন করে আসছে তার আনন্দ প্রকাশ, অপরের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার এবং সমঝোতা ও সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করার জন্য। ঢাকাতে বসবাসরত মুসলমানদের প্রচুর পারিবারিক ও ধর্মীয় উৎসব রয়েছে যা অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে উদযাপন করা হয়। পারিবারিক উৎসবের মধ্যে বিবাহ উৎসবকে সবচেয়ে প্রাচীন অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচ-গান, আমোদ-আনন্দ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হতো। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে গানবাজনার জন্য ডাক পড়ত ঢাকার কাওয়াল দলের। তারা বর-কনের প্রশংসামূলক ইসলামি গজল পরিবেশন করে বিয়ে বাড়িতে উৎসবের আমেজ তৈরি করতেন। এছাড়া আত্মীয়স্বজনের নাম ধরে তারা গান বাধতেন, পেতেন সেলামি ও বখশিশ। বিশেষ করে শিয়া কাওয়ালি গায়কেরা টুপি ও বিশেষ পোশাক ছাড়া গান বাজনা পছন্দ করতো না।[৬৬] কাওয়ালদের পাশাপাশি আরেক দল ছিল মিরাসিন। বিয়ে অথবা মুসলমানি উৎসবে এদের এনে গান বাজনা করা হতো। তাদের গানের ভাষা ছিল হিন্দি, উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত ঢাকাইয়া ভাষা। গোটা বিশ শতক জুড়ে মুসলমান বিয়েবাড়িতে অন্দরমহলের মহিলাদের বিনোদনের দায়িত্ব ছিল এই মিরাসিনদের উপর। অভিজাত পরিবারের বিয়ের আসরে অন্দরমহলে ২/৩ দিনব্যাপী মিরাসিন নৃত্যগীত দেখা যেত।[৬৭] মিরাসিন মূলত কুট্টি গোত্রের নিম্নবিত্ত পরিবারের মাঝ বয়সী মহিলার দল যারা ঢোলবাদ্য বাজিয়ে, হাসি-ঠাট্টা করে বিয়ে বাড়ী আনন্দ মুখরিত করে উপার্জন করতেন।[৬৮] বিনোদনের প্রয়োজনে 'মিরাসিনরা' পুরুষের বেশেও গান করত বা অঙ্গভঙ্গি করত।[৬৯]

আলোচ্য সময়ে মুসলমান সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ঢাকার মুসলমানরা বিবাহের কনে নির্বাচনের সময় সাধারণভাবে দৈহিক সৌন্দর্য, পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কনেপক্ষের আপ্যায়ন ও শুভ-অশুভ কিছু নির্দেশককে প্রাধান্য দিত। অভিজাত মুসলমান সমাজেও বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর 'কুরসীনামা' (বংশ পরিচয়) উভয়পক্ষই গ্রহণ করত। সেসময় পাত্রের বিদ্যা বা কর্মদক্ষতার চাইতে এই পরিচয় অধিক প্রয়োজনীয় ছিল।[৭০] বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বরপক্ষের দেয়া গহনা ও শাড়ি কনেকে পরানো হতো। এক্ষেত্রে প্রথমে নাকফুল বা নথ পরানোর নিয়ম ছিলো।[৭১] অভিজাত পরিবারে কনেকে বরপক্ষ প্রচুর গহনা দেওয়ার পাশাপাশি সোনা-রূপার সুতায় বোনা শাড়ি, ব্লাউজ ও এখলাই (বিয়ের ওড়না) উপহার দিত।[৭২]

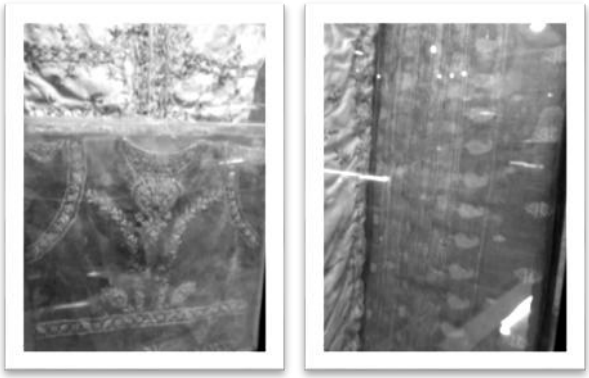

চিত্র: ৩ পঞ্চায়েত প্রধান মাওলা বখ্‌শ সরদারের স্ত্রী বিলকিস বানুর বিয়ের পোশাক (১৯৩১ খ্রি.) 'ঢাকা কেন্দ্র' সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তবে উনিশ শতকে ঢাকাতে শিয়াদের প্রভাব বেশি থাকলেও শিয়া ও সুন্নিদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে খুব কমই দেখা গেছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে অতীতে সুন্নি মেয়ে বিয়ে করে অনেক শিয়া সুন্নিতে পরিণত হয়েছেন বলে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন।[৭৩] বেঙ্গল ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৬ (এবং ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সংশোধনীসহ) আইনে পরবর্তীকালে শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নিবন্ধক থাকার বিশেষ বিধান রাখা হয়েছিল।[৭৪] আজো মুসলমান সমাজে এ বিষয়গুলো মেনে চলা হয়। অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠান যেমন: সন্তান জন্মদান সংশ্লিষ্ট উৎসব, আকিকা, সুন্নতে খৎনা, নাক-কান ফোড়ানি ইত্যাদিও ঢাকার মুসলমান সমাজে গুরুত্বের সাথে পালিত হতো। ঢাকার অধিবাসীরা পাঁচ, সাত ও নয় মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্তানসম্ভবাকে সাধ খাইয়ে থাকত।[৭৫] ব্রিটিশ আমলে ঢাকাতে শিশুর নামকরণে ধর্মীয় গ্রন্থের (কুরআন শরিফের) সাহায্য গ্রহণ ও আকিকা উৎসব উদযাপনের রীতিনীতির কথা জেমস ওয়াইজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৬]

মুসলমান সমাজে সব সময় শান-শওকত ও আড়ম্বরের সাথে শবে বরাত, রমজান, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, ঈদ ও মহররম প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবাদি উদযাপন করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে শবে বরাতের রাতে নবাববাড়ি ও দিলকুশা মসজিদে মিলাদ-মাহফিল হতো।[৭৭] অনেকে ঢাকার বিভিন্ন মাজার ও দরগাহে যেতেন। ঢাকায় এদিন বিকেল থেকে অসহায় দরিদ্রদেরকে অর্থ ও খাবার বিতরণ করা হতো। শবে বরাতের উৎসবে ঢাকা শহরে তখন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নানারকম রুটি, হালুয়া প্রস্তুত করে পাঠানো হতো। বিত্তবান পরিবারগুলোতে এর সাথে নতুন জামাকাপড়ও পাঠানোর রীতি ছিলো। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে ঢাকার শবে বরাতের রাতে পরিবেশ কেমন ছিল তা আমেতুল খালেক বেগমের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "শবে বরাতের দিন হালুয়া রুটি বিলি করার ব্যবস্থা সব বাড়িতেই ছিল। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশিদের বাসায় এবং ফকির মিসকিনদের হালুয়া, বাকরখানি, বনরুটি ইত্যাদি খাওয়ানো হতো। মহররম, আশুরার দিন খিচুড়ি গোস্ত খাওয়ানো হতো, বিলি করা হতো।"[৭৮] এছাড়া প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে অতি জাঁকজমকের সাথে হজরত মোহাম্মদ (স:) জন্মোৎসব পালিত হতো। এছাড়া নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহল্লা সর্দারদের উদ্যোগে সেদিন ঢাকা শহরের সমস্ত মহল্লার পথ-ঘাট, দোকানপাট অতি সুন্দরভাবে সাজানো হত।[৭৯] আলো ঝলমল করে উঠত পুরো শহর। আহসান মঞ্জিলের দরবার কক্ষে এ উপলক্ষে বিভিন্ন সময় মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানের কথা জানা গেছে নবাব আহসানুল্লাহর লেখা ডায়েরি থেকে।[৮০] এ উপলক্ষে নবাব

পরিবারের সদস্যগণ দান খয়রাত করতেন বলেও জানা যায়। ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ঢোল পিটিয়ে ও কামান দাগিয়ে ঢাকাবাসীকে জানানো হতো।[৮১] ২০ জুলাই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে খাজা মওদুদের লেখা ডায়েরি থেকে জানা যায় ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়া উপলক্ষে খাজা মোহাম্মদ আজম সব মহল্লায় গিয়ে ঢোল পিটিয়ে নতুন চাঁদ দেখার ও আগামীকাল ঈদের খবর জানানোর আদেশ দেন।[৮২] ঈদ উপলক্ষে সে সময় নবাব বাড়ি রঙবেরঙের নিশান ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা হত।[৮৩] বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ঢাকা শহরে শোভাযাত্রা বা মিছিল করে মসজিদে ও ঈদগাহে নামাজ পড়তে যাওয়ার প্রচলন ছিল। ঢাকার মুসলমান সমাজের নেতৃত্বে থাকা নবাব পরিবারের লোকেরা সাধারণত শেরওয়ানী, আচকান, চুড়িদার পায়জামা, রুমীটুপি কিংবা নবাব পরিবারের মেয়েদের তৈরি নকশাকৃত গোলটুপি পরে ঈদের জামাতে যেতেন।[৮৪] ২৫ জুলাই ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ডায়েরি থেকে জানা যায় খাজা মওদুদ ২৫ টাকা দিয়ে হোসেনি দালান এলাকার হাট থেকে একটি কোরবানির গরু কেনেন।[৮৫] তখনকার দিনে ২৫/৩০ টাকা দিয়ে মোটামুটি ভালো একটা গরু কেনা যেতো। আজকের দিনের মতো সেকালে সবার কোরবানি করার সামর্থ্য বা উৎসাহ কোনটাই ছিল না। নবাব পরিবার, কিছু অভিজাত বা সম্পন্ন পরিবার কেবল এই ঈদ পালন করতেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে সাধারণভাবে সামাজিকতার সাথে ঈদ উৎসব পালিত হতো। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকায় ঈদ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর। নবাব ও অন্যান্য মুসলমান ধনাঢ্য ও অভিজাত ব্যক্তিরা এখানে থাকতেন বিধায় ঈদ পৃষ্ঠপোষকতা পেত। ঈদের দিন ঢাকার বড় বড় মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত হতো। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ঈদের দিন আনুষঙ্গিক আনন্দ হিসেবে নতুন যোগ হয়েছিল একটি লোকায়ত উপাদান মেলা। আশরাফ-উজ-জামান তাঁর আত্মজীবনীমূলক এক নিবন্ধে ঢাকার মেলার কথা লিখেছেন, 'ঈদের মেলা হ'ত চকবাজারে এবং রমনা ময়দানে। বাঁশের তৈরি খঞ্চা ডালা আসত নানা রকমের। কাঠের খেলনা, ময়দা এবং ছানার খাবারের দোকান বসতো সুন্দর করে সাজিয়ে। কাবুলীর নাচ হ'ত বিকেল বেলা।'[৮৬]

চিত্র: ৪ উনিশ শতকের প্রথম দিকে নবাবি আমলের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বীর জলরঙে আঁকা ঈদ মিছিলের সংগৃহিত আলোকচিত্র ।

উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকায় শিয়া সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রবল। এর রেশ ঢাকা শহরে এখনও রয়েছে। ইরানি সংস্কৃতির একটি অন্যতম উদাহরণ ছিলো ঢাকার ঈদের মিছিল। এ ধরনের মিছিল বাংলাদেশের অন্য কোথাও বের হতো বলে জানা যায় না। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জি. গ্রাহাম। তাঁর আত্মস্মৃতি থেকেও আমরা জানতে পারি মহররম অনুষ্ঠানকে ঘিরে শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তো। যার ফলে ব্রিটিশ সরকারকে সবসময় সচেতন থাকতে হতো। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন শিয়ারা ছিল ইরানি বংশোদ্ভূত ঢাকার গণ্যমান্য মুসলমান ব্যক্তি।[৮৭] নবাব নুসরত জংয়ের দরবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বীরসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী জলরঙে কিছু ছবি এঁকেছিলেন।[৮৮]

এ চিত্রমালা দেখলে বোঝা যায়, নবাবি আমলের ঢাকার মহররম ও ঈদ মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ ও ব্যাপকতা। ঢাকাতে নায়েব নাজিমদের শাসনকালে বার্ষিক ঈদ ও মহররম মিছিল নিমতলী প্রাসাদ দেউড়ি থেকে বের হত নায়েব নাজিমদের নেতৃত্বে।[৮৯] পরবর্তীতে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিমদের বংশ ও পদ বিলুপ্ত হলে হোসেনী দালানের রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল দায়িত্ব ও মহররম উৎসব পালনের যাবতীয় ব্যয়ভার ও দায়িত্ব ঢাকার নবাবদের উপর অর্পিত হয়।[৯০] এ দায়িত্ব পালন করায় নবাব খাজা আবদুল গণি ঢাকা শহরের হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। তিনি মহররম, ঈদের মিছিলের পাশাপাশি জন্মাষ্টমী বা কালীপূজায়ও অংশ নিতেন।[৯১]

ঈদ মিছিলের পুনরায় প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ তৃতীয় দশক থেকে। নবাব পরিবার অর্থ দিয়ে ঈদ মিছিলে সহযোগিতা করার ফলে মিছিলটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে।[৯২] নবাব বাড়ির খাজা শাহাবুদ্দীন ও খাজা ইসমাইল মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাদের সরদার, আবদুল আজিজ, জুম্মন বেপারী মিছিলের দায়িত্বে থাকতেন। তাছাড়া মিছিলে থাকত বিভিন্ন এলাকার কাসিদার দলসমূহ। ঈদ মিছিলে তখনকার বড় আকর্ষণ ছিল শহরে নতুন আনা মোটর গাড়ি। মমিন মোটর কোম্পানির মোটরযানগুলোকে জাহাজ, প্লেন, ময়ুর, নৌকার মত সাজিয়ে মিছিল বের করা হতো। এই মিছিল জুম্মন বেপারীর বাড়ির নিকট থেকে শুরু হয়ে চক থেকে মোগলটুলি, ইসলামপুর, সদরঘাট হয়ে কাছারি, নবাবপুর, বংশাল হয়ে পুনরায় চকবাজারে এসে শেষ হয়ে যেত।[৯৩] মুসলমানরা এই মিছিলের অধিকাংশ গান উর্দুতে গাইত। বিভিন্ন এলাকার যুব সম্প্রদায় শরবতের গাড়ি নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। মিছিলে শরবত পান করানো নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

মহররম শিয়াদের উৎসব হলেও সুন্নি মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও তাতে অংশগ্রহণ করতেন। এসময় হিন্দুরাও বিভিন্ন আচার ও সংস্কার পালন করতেন। মহররমের ১লা তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ঢাকার প্রায় প্রতি মহল্লায় অবিরত বাদ্য-বাজনা চলতো। দশ তারিখে তাজিয়ার মিছিল উচ্চ শব্দে বাদ্য-বাজনা সহকারে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করতো। ঢাকায় মহররম উদযাপনের স্মৃতিচারণ করে যোবায়দা মির্যা তার আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন, "মহররমের মিছিল এখনো হয়। তবে আগের মত অত জাঁকজমক নেই। এখন মনে হয় এটা যথার্থই শোকের ঘটনা। তখন কিন্তু আনন্দ উৎসবের মত লাগতো। বিশেষ করে মহররমের পরের দিন দলবেঁধে বাড়ীতে এসে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, আগুনে গোল্লা ঘুরিয়ে মুখে ধরে রাখা-কত আশ্চর্য কৌশল দেখিয়ে বখশিশ নিয়ে যেত মহল্লার ছেলে ছোকরার দল।"[৯৪] বর্তমানে ঢাকা শহরে হোসেনী দালান ও বিভিন্ন মহল্লার ইমামবাড়ায় প্রথা মত মহররম পালিত হলেও রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানে সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছে মাত্র। কিছু আচার-অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়েছে আবার ১৯৪৭ পরবর্তী শিয়া মোহাজেরদের কারণে নতুন কিছু সংযোজিত হয়েছে। তবে মহররমের দশ দিনের মূল আচার-অনুষ্ঠানে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। বিশ শতকের প্রথমার্ধেও মিছিলের যে জাঁকজমক ছিল বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ক্রমে তা হ্রাস পেয়েছে।

ভাষা

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, ঢাকার মুসলমানদের মধ্যেও তা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান ছিল। নানা প্রতিবন্ধকতায় বাংলার মুসলমানদের পক্ষে যেমন আশানুরূপ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, তেমনি বিভ্রান্তির কবলে পড়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়নি। এসময় ঢাকার মুসলমান সমাজের একাংশের মধ্যে এ বিশ্বাস ও ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ইংরেজির মতো বিদেশি ভাষা কিছুতেই শেখা উচিত নয় তবে ধর্মীয় কারণে আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

সমকালীন ঢাকার সমাজের একজন সম্মানীত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হেকিম হাবিবুর রহমান উর্দুভাষী বাঙালি মুসলমান তথা খোশবাস সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সঠিক উর্দুতে কথা বলতেন। তিনি বাংলা বুঝতেন ও বলতে পারতেন কিন্তু উচ্চারণ ও ভঙ্গিতে বুঝা যেত যে তিনি বাংলাভাষা চর্চা কম করতেন।[৯৫] সমকালে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে উর্দু ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা ছিল সমগ্র বাংলার মুসলমান সমাজে লক্ষণীয়। সাহিত্যিক আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) আত্মজীবনী থেকে জানা যায় অভিজাত এই মুসলমান শ্রেণি বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁরা চর্চা করতেন আরবি-ফারসি-উর্দুর। এগুলো ছিল তাঁদের পেশা আর ছিল মনের খোরাক। বাংলা মাতৃভাষা হলেও বাংলা ভাষাকে তাঁরা খুব সুনজরে দেখতেন না। সামান্য ঘরোয়া চিঠিপত্র আর দলিল-দস্তাবেজের বাইরে বাংলাকে তাঁরা চর্চার যোগ্যই মনে করতেন না।[৯৬] উল্লেখ্য সেকালে অধিকাংশ মুসলমান পরিবারের চিন্তাধারা ছিল এরকম। তিনি যখন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ) ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেন। এসময় তাঁর বাংলা ভাষাতে একটি লেখা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে খবরটি শুনে তার পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হন।[৯৭] এসময় মুসলমান সমাজের অনেকের ধারণা ছিল যে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নয়। বাংলার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় কথা বলতে এদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। খাজা মোহাম্মদ আজমের মতে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকায় ১৩৩ টি পঞ্চায়েত ছিল যা মহল্লার লোকেদের ভাষার ভিত্তিতে বারা (বার) ও বাইস (বাইশ) বিভক্ত ছিল। বারা পঞ্চায়েত সদস্যরা মুসলমানি বাংলা ও বাইস পঞ্চায়েত সদস্যগণ স্থানীয় বাংলার সাথে মিশ্রিত উর্দু উপভাষায় কথা বলতো যা ঢাকাইয়া উর্দু নামে পরিচিত।[৯৮] অর্থাৎ ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত অভিজাতশ্রেণি বা সুখবাসীরা ঢাকাইয়া উর্দুতে কথা বলতো এবং স্থানীয় অভিজাত বাঙালি মুসলমান ও শ্রমজীবী কুট্টিরা আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত ঢাকাইয়া বাংলাতে কথা বলত। কাজেই আলোচ্য সময়ে ঢাকা শহরে প্রধানত উপভাষা মিশ্রিত বাংলা ও উর্দুর প্রচলন ছিল। কামরুদ্দীন আহমদ এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> মুসলমান ছেলেরা তখনকার দিনে অন্তত ঢাকা শহরে বাংলাকে মাতৃভাষা বলে ভাবতে শিখেনি। খাজা পরিবারের লোকেরা উর্দু বলত, ঢাকার রইচ কুট্টি ও শাঁখারীরা উর্দু ও বাংলার একটা খিচুড়ী বানিয়ে সেটাকেই মাতৃভাষা বলে চালিয়ে দিয়েছিল। ঢাকার বুর্জোয়া হিন্দুরা বাংলাদেশীয় বাংলা বলত আর আধা সামন্তবাদী বুর্জোয়া মুসলমান সম্প্রদায় খাজা সাহেবদের সঙ্গে মেশার জন্য এবং চাকরবাকর শাসাবার জন্য আর বিশেষ করে তারা যে বাংলার বাইরের মুসলমান তা প্রমাণ করার জন্য উর্দু ভাষার চর্চা করত। দেশের নেতারা যেখানে উর্দুভাষী-অনুগামীরা অন্য ভাষাকে স্বাভাবিক কারণেই তেমন আপন ভাষা বলে ভাবতে পারেনি। আমাদের অবস্থা ছিল মাতৃভাষাহীন একটি জাত যারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলে মিথ্যা দাবী করতে চাইত আর বাংলাকে বিমাতা মনে করে দূরে ঠেলে রেখেছিল।[৯৯]

তবে ধীরে ধীরে এ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। মূলত ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সমকালীন লেখকদের সোচ্চার বক্তব্য এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কেবল অস্তিত্বের স্বার্থে নয় বরং বাঙালি মুসলমানের জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে মাতৃভাষা বাংলা চর্চার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছিলেন যা তাঁদের বিভিন্ন লেখনিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কর্তৃক 'শিখা আন্দোলন' ঢাকাকেন্দ্রিক ইসলামি জগতে প্রথম আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা আধুনিকতার অনুসন্ধান করেছেন কুসংস্কার ও আধুনিকতা বিরোধী সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ সময়কালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বজায় থাকলেও পরবর্তীকালে এর সমাধানে গুরুত্ব দেয়া হয়। ঢাকার মুসলমানদের একটি অংশ

যারা নিজেদের আভিজাত্য রক্ষার নামে বাংলা ভাষাকে অবহেলা করত, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার সাথে নিবিড় পরিচয়ের ফলে তাদের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত হতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে তারা উপলব্ধি করে যে বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা।

উপসংহার

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে সংগঠিত সিপাহী বিদ্রোহের জের ধরে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শতাব্দিকালের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ফলে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ শাসনামল শুরু হয়। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বিশেষ বছর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববাংলা ও আসামকে কেন্দ্র করে নতুন প্রদেশ গঠন ও ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে ঢাকায় বসবাসকারী মুসলমানগণ নতুন যুগের চিন্তা-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৮৫৮-১৯৪৭ সময়কালে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ঢাকার মুসলমানেরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের ফলে তাদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৮-১৯৪৭ সময়কাল ঢাকার মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক যেমন খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, উৎসব ও ভাষার ক্ষেত্রে একটি জটিল এবং পরিবর্তনশীল চিত্র তুলে ধরে। এই সময়ে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। একদিকে যেমন নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইসলামিক রীতিনীতি দৃঢ়ভাবে বজায় ছিল, তেমনি ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ তাদের জীবনযাত্রায় স্পষ্ট ছাপ ফেলে। মোটকথা আলোচ্য সময়ে ঢাকার মুসলমানরা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল একটি জীবন যাপন করতেন, যেখানে তাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ এবং নতুন যুগের চাহিদার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এই সময়ের জীবনযাত্রা পরবর্তীকালে ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঢাকার মুসলমানদের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভিন্ন বিষয় ও বৈচিত্র্যে ভরপুর এবং বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের লোকাচার, রীতিনীতি বিষয়ে শিয়া-সুন্নি, ধনী-দরিদ্র ব্যবধান লক্ষণীয়। ঢাকার সংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সংস্কার ও রীতিনীতির মিথষ্ক্রিয়া ছিল। আবার ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের চিন্তা ও অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া গবেষণার কালসীমায় (১৮৫৮-১৯৪৭) প্রথমভাগে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচয়, রাজনীতি সচেতনতা ও পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাবের ফলে তাদের চিন্তা চেতনায় ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতায় পরিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়া বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নানা কুসংস্কার পুরোপুরি তিরোহিত না হলেও কমতে শুরু করে। অপরদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসারে বিশেষত বঙ্গভঙ্গের পর বাংলার পরিবর্তে অভিজাতশ্রেণির মধ্যে উর্দুপ্রীতি আরো বৃদ্ধি পায় যা বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পথে বাধাস্বরূপ ছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরবর্তীতে ভাষাচিন্তা ও বাংলা সাহিত্যে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশভাগ পরবর্তী রাজনীতির কাঠামোয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা তথা বাংলার নতুন শাসনকাঠামো ও ইতিহাসের ধারা সৃষ্টি হলেও ঢাকার মুসলমান জনজীবনে আলোচ্য সময়কালের প্রভাব অনস্বীকার্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৭৩; Ahmad Hasan Dani, *Dacca: A Record of its Changing Fortunes* (Dhaka: A.K.M Abdul Hai, Asiatic Press, 2nd ed. 1962), p. 24.

[২] F.D. Ascoli, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the Dacca District*, Calcutta, 1917. উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, 'পুরানো ঢাকার ঘরবাড়ি', *ঢাকা সমগ্র* ১ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), পৃ. ২০৫।

[৩] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩), পৃ. ৪৩৭।

[৪] এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *দ্বিতীয় খণ্ড (১৫৭৬-১৭৫৭)*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২), পৃ. ১৫।

[৫] Syed Mohammed Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka* (Dhaka: The Pioneer Printing Press Ltd, 1956), p. 197.

[৬] মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গরীবদের জীবন* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ২৪০।

[৭] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ৪৮৪।

[৮] শরীফ উদ্দিন আহমেদ ও শায়লা পারভীন, "ঢাকাবাসীর প্রাত্যহিক খাবার," অন্তর্গত, *ঢাকাই খাবার*, হাবিবা খাতুন ও হাফিজা খাতুন সম্পা. (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ১৮৫ ।

[৯] *তদেব*, পৃ. ১৮৫ ।

[১০] জেমস্ টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনু. (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৩), পৃ. ১৬৫। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন জেমস্ টেলর রচিত গ্রন্থটি মূলত ঢাকার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত তবে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। গ্রন্থটিতে সরকারি দলিলপত্রাদি ও লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

[১১] রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, এ.এম.এম শরফুদ্দীন অনু. মূল উর্দু গ্রন্থ ১৯১০ (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২০), পৃ. ২১।

[১২] হাবীবুর রাহমান, *ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে*, হাশেম সূফী অনু., মূল উর্দু গ্রন্থ ১৯৪৯ (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০২০), পৃ. ৫৪-৫৭।

[১৩] জেমস্ টেলর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬।

[১৪] শরীফ উদ্দিন আহমেদ ও শায়লা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫ ।

[১৫] মো: আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস: ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাবমহল, ২০১৪), পৃ. ২৬৭।

[১৬] মোহাম্মদ আফজাল, "ঢাকার টুকিটাকি", *ত্রৈমাসিক ঢাকা*, বর্ষ ২, সংখ্যা ১ (ঢাকা কেন্দ্র প্রকাশিত, মার্চ ২০০৯), পৃ. ৫৩।

[১৭] জেমস্ টেলর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

[১৮] *তদেব*, পৃ. ১৭-১৯।

[১৯] *তদেব*, পৃ. ১৯।

[২০] *তদেব*, পৃ. ১৩৩-৩৪।

[২১] *তদেব*, পৃ. ২১।

[২২] মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

[২৩] শরীফ উদ্দিন আহমেদ ও শায়লা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

[২৪] জেমস্ টেলর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

[২৫] A.C. Sen, *Agricultural Reports of the Dacca District* (Culcutta: Bengal Secretariat Press, 1889); উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গরীবদের জীবন*, পৃ. ৪৬।

[২৬] এটি একটি বিশেষ পদ্ধতিকে খাবার পরিবেশন রীতি। এটি তৎকালীন ঢাকার সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও উৎকৃষ্টমানের কমপক্ষে ২৪ পদের খাবার যা বিশেষ মেহমানদের জন্য ফুলের তোড়ার মত করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হতো। বিশ শতকের বিশের দশক পরবর্তীকালে ক্রমে এই ব্যয়বহুল রীতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

[২৭] আবুয্ যোহা নূর আহমদ, *উনিশ শতকে ঢাকার সমাজজীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫ প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৭১।

[২৮] গাজী রুমানা রহমান ও সোনিয়া বেগম, "ঢাকার সামাজিক উৎসবের খাবার," অন্তর্গত, *ঢাকাই খাবার*, পৃ. ১৪৯।

[২৯] আখতার ইমাম, *আমার জীবন কথা (১৯১৭-১৯৫০)* (ঢাকা: জাতক পরিবেশনা, ১৯৯৩), পৃ. ৯৫।

[৩০] সাঈদ আহমদ, *জীবনের সাতরং* (ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২৬।

[৩১] মাহমুদা আক্তার পলি, "উনিশ শতকে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্য: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০২১), পৃ. ১৯৫।

[৩২] শামসুর রাহমান, *স্মৃতির শহর* (ঢাকা: নগর জাদুঘর, ১৯৯০), পৃ. ৪২-৪৩।

[৩৩] কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ ও ঢাকা সহচর*, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯১০ (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৯), পৃ. ৯২।

[৩৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮৭, ৫ ডিসেম্বর ১৮৮০। উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫) চতুর্থ খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ. ২০৪।

[৩৫] মাহমুদা আক্তার পলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫।

[৩৬] *তদেব*, পৃ. ১৯৫ ।

[৩৭] Syed Mohammed Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, pp. 261-62.

[৩৮] জেমস্ টেলর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০; চার্লস ড'য়লি, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, শাহ্ মুহম্মদ নাজমুল আলম অনূ.ও হায়াৎ মামুদ সম্পা. (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০১১), পৃ. ৩০।

[৩৯] শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগরজীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০১০), পৃ. ১৪৯।

[৪০] *তদেব*, পৃ. ১৪৯।

[৪১] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার কথা* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৬), পৃ. ৪০।

[৪২] Walters, Henry, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches, Vol. 17,* pp. 538-48. উদ্ধৃত, শরীফউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-৪৮ থেকে সংগ্রীহিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ছক আকারে প্রস্তুতকৃত।

[৪৩] গাজী মোঃ মিজানুর রহমান, "উনিশ শতকে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০১২), পৃ. ২৫২।

[৪৪] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ ১৮৫৭-১৯০৫* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৯), পৃ. ৪৩।

[৪৫] মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

[৪৬] প্যাট্রিক গেডেডস, *ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন ১৯১৭*, অনূ. আবদুল মোহাইমেন (ঢাকা: নগর জাদুঘর, ১৯৯০), পৃ. ১৬।

[৪৭] Ahmad Hasan Dani, *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*, p. 8.

[৪৮] মুনতাসীর মামুন, "পুরানো ঢাকার ঘরবাড়ি", *ঢাকা সমগ্র ১*, পৃ. ২২৩।

[৪৯] আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১৩৭-৩৮।

[৫০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: আহমেদ পারভেয শামসুদ্দীন প্রকাশিত, ১৯৮৯), পৃ. ৯০।

[৫১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬-১৯৩৯*, পাপড়ীন নাহার অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ৪৩-৪৪।

[৫২] আখতার ইমাম, *আমার জীবন কথা (১৯১৭-১৯৫০)* (ঢাকা: জাতক পরিবেশনা, ১৯৯৩), পৃ. ১১৫।

[৫৩] সাঈদ আহমেদ, *ঢাকা আমার ঢাকা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ২২।

[৫৪] গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩।

[৫৫] *তদেব*, পৃ. ৪৮২।

[৫৬] কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ৩৭-৩৯।

[৫৭] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

[৫৮] আমেতুল খালেক বেগম, *আমার দেখা ঢাকা শহর জীবন পাতার জলছবি* (ঢাকা:জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ৫৮।

[৫৯] আখতার ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[৬০] খাজা মওদুদের ডায়েরি (অপ্রকাশিত) ১৯১৭, উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯০৪-১৯৩০* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৬), পৃ. ৯৪।

[৬১] জেমস্ টেলর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

[৬২] A.C. Sen, *Agricultural Reports of the Dacca District, op.cit.*pp. 29-30.

[৬৩] হাবীবুর রাহমান, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা অংশ, পৃ. ২৩।

[৬৪] শামসুর রাহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

[৬৫] আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* (ঢাকা: বাতিঘর, ২০২০), পৃ. ১৬২।

[৬৬] রেবেকা আহমেদ, "পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সংগীত", *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* (গ্রীষ্ম সংখ্যা, ২০১৪), পৃ. ৬৯। পুরনো ঢাকার কাওয়ালি ভক্ত আবুল হাসনাত রোডের 'খাদেম ই সিলসিলা' শিবলী মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁদের বাড়িতে ধারাবাহিকভাবে কাওয়ালির অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন।

[৬৭] আখতার ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

[৬৮] রোজি মাজিদ আহসান ও হাফিজা খাতুন, "*ঢাকা নগরীর নারীর আর্থ-সামাজিক পরিচয় কালের বিবর্তন*", *ইতিহাস, চুয়াল্লিশ বর্ষ* (কার্তিক-চৈত্র ১৪১৬, ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ৫৭। ফারসি শব্দ মিরাসি অর্থ পুরুষ গায়কের দল আর মিরাসিন অর্থ মহিলা গানের দল যারা শুধু নাক-কান ছেদানী আর বিয়ের উৎসবে গান-বাজনা করে। হাবীবুর রাহমান, *ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে*, পৃ. ৪৫-৫১।

[৬৯] রেবেকা আহমেদ, "পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সংগীত", পৃ. ৭৫।

[৭০] আমেতুল খালেক বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

[৭১] *তদেব*, পৃ. ৯৪।

[৭২] সাক্ষাৎকার, আনার বেগম (৮৪), গৃহিণী, বংশাল, উদ্ধৃত, শায়লা পারভীন, *উনিশ-বিশ শতকে পুরোনো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮), পৃ. ১০০।

[৭৩] জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, ফওজুল করিম অনূ.ও মুনতাসীর মামুন সম্পা. (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৪), পৃ. ১৩৭।

[৭৪] *The Bengal Mummadan Marriages and Divorces Registration Act, 1876* (As modifided up to the 20th May, 1935) , Superintendent, Government Printing Press, Alipore, Bengal, 1935 (Calcutta: Messrs. S. K. Lahiri & Co., College Street, 1935), p. 2. (Accession No. 579) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিস থেকে সংগৃহীত নথিপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

[৭৫] শায়লা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৯। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাকে তার ইচ্ছানুযায়ী বা সাধ খাবার খেতে দেওয়া হয় তা সাধারণভাবে সাধভক্ষণ নামে পরিচিত।

[৭৬] জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, পৃ. ৬৩।

[৭৭] মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

[৭৮] আমেতুল খালেক বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

[৭৯] আবুয্ যোহা নূর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

[৮০] মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০।

[৮১] খাজা শামছুল হকের ডায়েরি (অপ্রকাশিত) ১৯০৬। উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

[৮২] খাজা মওদুদের ডায়েরি (অপ্রকাশিত) ১৯১৭। উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

[৮৩] মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬।

[৮৪] *তদেব*, পৃ. ২৬৬।

[৮৫] খাজা মওদুদের ডায়েরি (অপ্রকাশিত) ১৯২৩। উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[৮৬] আশরাফ-উজ-জামান, "থিয়েটার যুগের ঢাকা", *ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২০৯।

[৮৭] জি. গ্রাহাম, *উনিশ শতকের বাংলার মফস্বল*, আখতার জাহান দোলন অনু. (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৯৪।

[৮৮] আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে ৩৯টি ছবি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা আছে। ছবিগুলোর আকার ২৪ × ১৮ ইঞ্চি। তার মধ্যে ২২টি ঈদের এবং ১৭টি মহররম মিছিলের ছবি। ১৭টি ছবি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হলেও বাকিগুলো স্টোরে রাখা।

[৮৯] ফিরোজ মাহমুদ, "নায়িব-নাজিম," অন্তর্গত, *বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মোগলযুগ (আনু. ১২০০-১৮০০ সা. অব্দ)* প্রথম খণ্ড, আবদুল মমিন চৌধুরী সম্পা. (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ৩৩০ ।

[৯০] মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯ ।

[৯১] মুনতাসীর মামুন, "হৃদয়নাথের ঢাকা শহর", *ঢাকা সমগ্র ১*, পৃ. ২৮।

[৯২] ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের আর্থিক দৈন্যতা বৃদ্ধি পেলেও সরকারের বিভিন্ন সংস্কার বিশেষত (১৯০৫-১৯১১) বঙ্গভঙ্গ ও তার রদ মুসলমানদের উপর গভীর সামাজিক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে ধর্মভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন বিশ শতকের গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়। এই বিভাজন যেমন একদিকে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তেমনি অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং পৃথক রাজনৈতিক পরিচয়ের আকাঙ্খা জন্ম দেয়। সে সময় ঈদ মিছিল তথা ধর্মীয় উৎসব ঢাকায় আরো বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে।

[৯৩] হাবীবুর রাহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭; নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: প্যারাডাইস প্রিন্টার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৩১৭-১৮।

[৯৪] যোবায়দা মির্যা, *সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৩৩।

[৯৫] হাবীবুর রাহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[৯৬] আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

[৯৭] *তদেব*, পৃ. ১৫-১৬।

[৯৮] Khwaja Mahomed Azam, A.N.J. den Hollander, *The Panchayat System of Dhaka*, Muntassir Mamoon ed. (Dhaka: The Dhaka City Museum, 1990), p. 16.

[৯৯] কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।